বাঙলা ভাষার গঠন

সুহৃদকুমার ভৌমিক

বাঙলা ভাষার গঠন

মনফকিরা
www.monfakira.com

সুহৃদকুমার ভৌমিক
বাঙলা ভাষার গঠন

ISBN: 978-93-80542-57-7

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৩

প্রকাশক : মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত, মুকুন্দপুর,
কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১/ ৯৪৩৩৪-১২৬৮২/ ৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.fakira@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in
ব্লগস্পট : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/monfakira2013
গুগল প্লাস : https://plus.google.com/u/0/111119619973026469315/posts
মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯
১০০ টাকা

সন্‌জীদা খাতুন
মাননীয়াসু

মনফকিরা প্রকাশিত

সুহৃদকুমার ভৌমিক লিখিত

আর্য রহস্য (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

ঝাড়খণ্ডে মহাপ্রভু

সুহৃদকুমার ভৌমিক সম্পাদিত

David J McCutchion
Unpublished Letters and Selected Articles

সূ চি

বাঙলা ভাষা গঠনে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভূমিকা ১১

প্রাচীন বঙ্গের আদিবাসী পরিচয় ৩১

মেদিনীপুরের উপভাষায় দ্রাবিড় শব্দ ৫০

বাঙলায় বহুবচন গঠনে দ্রাবিড় উপজাতির অবদান ৬১

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কুড়ুখ ভাষা ৬৭

বাঙলায় নঞর্থক বাক্যগঠনে দক্ষিণী প্রভাব ৭১

কয়েকটি বাঙলা ও সংস্কৃত শব্দের উৎস সন্ধানে
আদিম দ্রাবিড় শব্দের বিচার ৭৫

সাদরি ভাষা ও বাঙলা ৭৮

ধিমাল জাতি ও ভাষার কথা ৯২

নিবেদন

ভাষাস্রোত নদীর স্রোতের মতো কোন প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। একটি ভাষা বিশেষ কোন জনজাতির মানুষজনের পরম্পরাক্রমে বাহিত। পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষের দিকে তার যাত্রা। কোন বিশেষ ভাষা বিচারের আগে আমাদের জানতে হবে কোন্ জনগোষ্ঠীর দ্বারা সেই ভাষা সংবাহিত ও লালিত। কারণ জনজাতিকে না জেনে তাদের ভাষার বিচার যথাযথ হয় না।

সংকর বাঙালি জাতির ভাষার বিচারে দেখা যায় এই বঙ্গভূমিতে বিচিত্র জাতির আগমন ঘটেছে এবং পরবর্তী কালে তাদের অনেকেই বাঙালিদের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। বাঙলা ভাষার কাঠামো থেকে বোঝা যায় অস্ট্রিক বা কোল্ল জাতির মানুষের দ্বারাই এই ভাষার বুনিয়াদ তৈরি হয়। দ্রাবিড় ভাষাসমূহের নানা ছোট-বড় উপাদান আমরা ভাবপ্রকাশের কাজে লাগিয়েছি। নিয়েছি বিস্তর শব্দও। ভোট-চীনীয়, বিশেষত বোডো ভাষাসাম্রাজ্যের নানা শাখার মাধ্যমে বাঙলায় প্রবেশ করেছে বিচিত্র ভোট-চীনীয় শব্দ।

এই পুস্তকে সংকলিত প্রথম প্রবন্ধটি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ পত্রিকার বিশেষ ভাষা সংখ্যায় (১৪১৬) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তাঁর আগ্রহে নতুন করে লিখি। বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালো-বাসা, রবীন্দ্র-নজরুলের সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর আগ্রহে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও তাঁর ভূমিকা কম ছিল না।

প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নানা পত্রিকা, স্মরণিকা এবং বক্তৃতার কারণে লিখিত। যাঁরা এক সময়ে এই সমস্ত প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আর নেই। তাঁদের উজ্জ্বল স্মৃতি হারিয়ে যায়নি।

পুস্তকটি প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব, সাজানো থেকে প্রুফ দেখা পর্যন্ত— সব কিছু ‘মনফকিরা’র কর্মীরা গ্রহণ করে আমাকে অসীম সাহায্য করেছেন।

শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক

মহালয় ১৪২০

বাঙলা ভাষা গঠনে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভূমিকা

বাঙলা ভাষার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় সংস্কৃত ভাষা নয়, প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহই বাস্তবে এই ভাষার উৎস। আমাদের গদ্য ও পদ্যের ব্যাকরণ বা 'শব্দানুশাসনে', অর্থাৎ কী ভাবে শব্দের পর শব্দ অনুশাসিত হলে অর্থবাহী বাক্য গঠিত হয়, কিংবা কী ভাবে শব্দের পর শব্দ যুক্ত হলে বাক্য ছন্দোবদ্ধ হয় ও আমাদের মনকে অর্থান্তরের ভাবরাজ্যে বহন করে আনে— তা অনুধাবন করলে এই ধারণা নির্ভুল বলেই মনে হবে।

ভাষার দুটি ভাগ, গদ্য ও পদ্য— এবং এ দুটিই বিশেষ শক্তিশালী একটি আদিবাসী ভাষার আদলে তৈরি হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার বহু পূর্বেই বলেছিলেন, ''বাংলাভাষাটা যে অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য ভাষা, সেটাও ক্রমে ক্রমে লোকে মানবে; আর্য্যামি যত দিন বাধা দিতে থাকবে, তত দিন বাংলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে।" (বাংলা ভাষার কুলজী, কৃষ্ণনগর নদীয়া সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত, 'সবুজ পত্র', ১৩২৫, *বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে* পুস্তকে সংকলিত)।

কিন্তু এই স্বরূপটি জানার আগে যাঁরা প্রাথমিক স্তরে বাঙলা ভাষা গঠনে যুক্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ বাঙালির পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন, তা জানতে হবে। কারণ বাঙলার প্রকৃত জনগোষ্ঠীকে না জেনে তাদের তৈরি ভাষাকে জানার কোন অর্থই হয় না। আমাদের পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন আর কাদের রক্তই বা আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত। মাত্র এক হাজার বছর আগে চর্যাপদের পূর্বে বাঙলা ভাষাই ছিল না। তার আগে কী ভাষায় বা এখানকার মানুষ কথা বলত?

বাঙলায় সভ্যতার বিস্তার অতি প্রাথমিক স্তরেই ঘটেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এ দেশের অনেক স্থানেই ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ প্রথম থেকেই ভারতের শিক্ষানীতিকে এমন ভাবে গঠন করতে চেয়েছিল যাতে আমরা ঐতিহ্যশূন্য হয়ে পড়ি। শেখাতে চেয়েছিল যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার দ্বারাই আমরা প্রাচীন যুগ থেকে উদ্ভাসিত

এবং আমাদের উচ্চবর্ণের মানুষরা তাদেরই বংশধর, সংস্কৃত নামক ভাষাটিও ইয়োরোপ থেকে যাযাবর মানুষদের দ্বারা বাহিত— সেই শিক্ষায় আমরা আজ পর্যন্ত শিক্ষিত হয়ে চলেছি।

২

আজকের দিনের অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিত অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন তামাম পৃথিবীতে যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দের অপব্যাখ্যা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আর্য শব্দটি হল সর্বাধিক ভাগ্যহীন। এর পশ্চাতে কাজ করেছে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সাম্রাজ্যবাদী লোলুপ বাসনাসিক্ত পণ্ডিতদের স্বেচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা, যাকে ঘোরতর অপরাধই বলা যায়। Professor Winfred P. Lehmann, Historical Linguistics— An Introduction বইতে (p. 19) বলেছেন, অনেক লেখক প্রাচীন Indic ও Celtic লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে আর্য গোষ্ঠীভুক্ত শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন এই নাম আর চলে না। এর পেছনে কাজ করেছিল একটি রাজনৈতিক ফন্দিবাজ চাল। "This name is now in dispute because of a misuse of it for devious political purpose." আর এ যুগের অন্যতম সমাজ-বিজ্ঞানী, বহুভাষাবিদ্, ভারতের প্রথম মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর Studies of Indian Social Polity নামক সুবিশাল গ্রন্থে (যার মূল বিষয় *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি* নামক তিন খণ্ডের বাংলা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে) ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা বলেছেন যে, আর্য বিষয়ক মিথ্যা ইতিহাস বা myth সৃষ্টির প্রধান কারণই হল ইয়োরোপীয় জাতি ও নেশনগুলির আগ্রাসী রাজনৈতিক আধিপত্যের অপচেষ্টা।

এই অপব্যাখ্যার জনক হলেন মাক্সমুলার। এশিয়াটিক সোসাইটির স্রষ্টা স্যার উইলিয়ম জোনস দেখেছিলেন, সংস্কৃত ভাষা হল একটি আশ্চর্য শক্তিশালী ভাষা। এর মূল শব্দে (root-word) প্রত্যয় ও উপসর্গের ব্যবহারে বিচিত্র শব্দের জন্ম— যে-পদ্ধতির কাছে ইয়োরোপীয়, গ্রিক, ল্যাটিন বা ইংরেজি, কোন ভাষাই দাঁড়াতে পারে না।

তখন ভারতের বিধাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্ভবত এই চিন্তাই হয়েছিল, ভারতবাসীর মনে দাস মনোভাব বা হীনতাবোধ সৃষ্টি করাই হবে স্থায়ী রাজ্য-শাসনের প্রধান হাতিয়ার। সে জন্য সংস্কৃতকে কত কম মর্যাদা দেওয়া যায়, তা-ই তারা ভেবেছিল। তখনই সৃষ্টি হয়েছিল এক কাল্পনিক আর্য জাতির। তারা নাকি হাঁটা-পথে যাযাবরের মতোই ইয়োরোপ থেকে এ দেশে এসে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করেছিল। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির

এত মিল। আর্য বিষয়ক এই নতুন ব্যাখ্যার জন্য মাক্সমুলার-কেই দায়ী করা হয়ে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মাক্সমুলার-এর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন ম্যাকলে। ম্যাকলে স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতের সমস্ত মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবরের একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— "It is my belief that if our plans of education are followed up there will not be a single idolater among the respectable castes in Bengal thirty years hence." (The Life and Letters of Lord Macaulay).

সেই plans of education-এর একটি পরিকল্পনা হল আর্য জাতির আবিষ্কার। মাক্সমুলার নিজেই বলেছিলেন তাঁর কর্মসমূহ "will hereafter tell to a great extent on the fate of India."

সত্যই কিছু দিন বাদে দেখা গেল আমরাই আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে দেখতে শুরু করেছি। স্বীকার করে নিয়েছি যে, ভারতীয় সভ্যতার গৌরব ও বৈশিষ্ট্য একটি বিদেশাগত যাযাবর জাতি থেকেই এসেছে— সেই বিদেশাগত সুসভ্য সুন্দর আর্য জাতির সন্তান আমরা। এমনকী হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের পরও আর্য নামক জাতির আগমনকে নির্মূল করা হয়নি। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে এ সব অ-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা ছাড়া কিছুই নয়।

মাক্সমুলার-এর প্রতি এই সন্দেহ প্রথম থেকেই ছিল। ভূপেন্দ্রনাথের মতে, "অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক জার্মান বংশোদ্ভব ম্যাক্স্-মুলার এই জাতীয় ভাষাভাষী আর্য নামধারী একটা মনুষ্যজাতির কল্পনা করেন। কিন্তু তিনি পরে ইংরেজ এবং উত্তর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বাধ্য হইয়া বলিলেন, 'আমি আর্য অর্থে একটা মনুষ্য জাতিকে বুঝি না একটা ভাষাকেই বুঝি।" (*ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি*, পৃ. ৮)।

মাক্সমুলার বলেছিলেন— "Aryan, in scientific language is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language, and if we speak of Aryan race at all, we should know that it means no more than Aryan speech." ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরিষ্কার করে বলতে চাইলেন, "It is worse than a Babylonian confusion of tongues— it is downright theft."

"কিন্তু তথাপি আজও জাতিসত্তাবিদ্‌গণ আর্য জাতিরূপ মতবাদের মোহ ছাড়িতে পারে নাই।" (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা*)। এক কথায় 'আর্য' এই নামে কোন জাতিই ছিল না। A History of the English Language গ্রন্থে Professor Albert C. Baugh (পৃ. ২২) বলেছেন, "Various names

have been used to designate this family. In books written a century ago, the term Aryan was commonly employed. It has now been generally abandoned."

বর্তমান কয়েক জন ভারতীয় ঐতিহাসিক ছাড়া বহির্বিশ্বে কেউই আর্য নামক জাতির অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেন না। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'বেদাদি গ্রন্থে আর্য শব্দের ব্যবহার' প্রবন্ধে বলেছেন, ঋগ্বেদে আর্য শব্দ মোট ৩২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোথাও এই শব্দ জাতি অর্থে বা ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ভাষ্যকার সায়নাচার্য ঐ ৩২ বার 'আর্য' শব্দ ব্যবহারের ব্যাখ্যায় কোথাও ভাষা বা জাতি বলেননি। ভূপেন্দ্রনাথ *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি* পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলেছেন, ''আমরা ঋগ্বেদে পাঠ করি যে, বৈদিক জনগণ— তাহাদের কৌমগত নাম দ্বারা পরিচিত হইত। যথা ভারতম জনম্, অর্য বা আর্য অর্থে চাষি বুঝাইত।" (পৃ. ৩২)। ভূপেন্দ্রনাথ ঋগ্বেদের আলোচনায় এই বাস্তব সত্যটুকুকেই প্রকাশ করেছেন। 'আর্য' বা চাষীদিগের জন্য বা ভারতগণের জন্যই ইন্দ্র বা অন্যান্য দেবতাদের নিকট ভূমি, বৃষ্টি ও গোধন বৃদ্ধির প্রার্থনা রয়েছে। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন দাস *হিন্দু-সমাজ বিজ্ঞান* নামক সুবৃহৎ পুস্তকে বলেছেন, ''বেদের বহু স্তোত্রে চাষের কথা আছে। ভূমি সুজলা সুফলা হয়, তাহার জন্য দেবতাদের নিকট অনেক প্রার্থনাও আছে। সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্ত হইল বৈদিক স্তোত্রকারগণের যে সমাজ তাহা সভ্যতার আদিম বা চাষের স্তরে মাত্র উঠিয়াছিল। তাঁহারা মন্তব্য করিলেন, বৈদিক মন্ত্র সব চাষার গান।"

মূল শব্দ ঋ বা 'আর' হল আর্য শব্দের উৎস, যার প্রাথমিক অর্থ হল লাঙল করা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন কৃষক লাঙল করে তার সীমায়িত ক্ষেত্রে বারংবার ঘুরে-ঘুরে, তাই 'ঋ' বা 'আর' অর্থাৎ ইংরাজিতে 'Re' বা পুনরায়। যখন মাক্সমুলার পণ্ডিতগণকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন, সেই সময় Zenaide Regozine, Vedic India নামক সুবিশাল পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "Let us now take the Sanskrit root AR of which the general and original meaning is 'plough'. We find it intact in Latin and Italian arere, in Slavic arati— to plough in Greek aratron, Latin aratrum, Tehekh, so called Bohemian, a slavic language— oraldo a plough, in English arable— fit to be ploughed, in Greek arowra, Latin arvum— a ploughed field." আর্য অর্থে কৃষক বা চাষি, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ''অহং ভূমি মদ দামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুতে মর্ত্যায় (৪/১৬/২৩)। ইন্দ্র বলেছেন, ''আমি আর্য অর্থাৎ কৃষকগণকে ভূমি দান করি, হবি দান-

কারী মনুষ্যগণকে আমি বৃষ্টি দান করি।" পরবর্তী কালে আর্য এবং ভারত শব্দ পরিশীলিত, সম্মানীয় রূপে গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'আর্যপুত্র' ইত্যাদি শব্দ জনপ্রিয়। গীতায় সম্বোধনার্থে 'ভারত' ও 'আর্য' শব্দের ব্যবহার আছে। মনে হয় 'আর্যাবর্ত' এবং 'ভারতবর্ষ' শব্দের উৎস পূর্বোক্ত দুটি শব্দ।

ইংরাজ কর্তৃক আর্যজাতির আগমন বিষয়ক ব্যাখ্যা আমাদের দেশের উচ্চ-বর্গের মানুষের মনে একটা অহংকার বোধ আনয়ন করল। উচ্চবর্গের মানুষরা আর্যদের বংশধর আর অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ অনার্য। এই পদ্ধতিকে ইংরাজের শাসনার্থে খণ্ডিকরণ পদ্ধতি বা divide and rule policy বলতে পারি।

কিন্তু ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক বিচার আর্য নামক জাতির ভারতে আগমনকে অলীক বলেই প্রমাণ করে। স্যার উইলিয়ম জোনস শুধু সংস্কৃত নিয়ে বিচার করে বলেছিলেন— এই ভাষা ল্যাটিন গ্রিকের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ়। আচার্য সুনীতিকুমারও দীর্ঘ দিন পূর্বে (১৩২৫) বলেছিলেন, ''কুক্ষণে এ দেশে বিলেত থেকে নতুন করে আর্য শব্দের আমদানি হয়েছিল। ম্যাক্সমুলারের লেখা পড়ে আর নব্য হিন্দুয়ানি দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদ হজমের ফলে একটা নতুন গোঁড়ামি আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, সেটার নাম হচ্ছে 'আর্য্যামি'। এই গোঁড়ামি আমাদের দেশে নানা স্থানে নানা মূর্তি ধরেছে— স্বাধীন চিন্তার শত্রু এই বহুরূপী রাক্ষসকে নিপাত না করলে ইতিহাস চর্চা বা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা— কোনোটাই নিরাপদ হয় না।" (বাংলা ভাষার কুলজী, ১৩২৫, *সবুজ পত্র*)

বাংলা ভাষার গঠনপর্ব বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আর্য নামক এক কল্পনাপ্রসূত জাতির আরোপিত ইতিহাসকে আমার নস্যাৎ করার প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারতীয় ভাষাসমূহ মূলত যে ভারতীয়দেরই সৃষ্টি, সে কথা বলা। সংস্কৃত ভাষা হল সংস্কার করা ভাষা, ভদ্রজনোচিত সর্বস্থানগ্রাহ্য বহুবিস্তৃত রাজদরবারের ভাষা, তাই দেব-ভাষা বা ভাষার দেবতা বা শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রাচীন জনগোষ্ঠীর বিচিত্র শব্দকে নিয়মের দ্বারা সংস্কার করে এক-একটি শব্দ তৈরি হয়েছিল। ফলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহে ভারতের বিচিত্র ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আপন-আপন ভাষার সন্ধান পান।

এই দৃষ্টি নিয়ে কাজ শুরু হয় ১৯২০ সাল থেকে। বেশ কয়েক জন দিক্‌পাল ভাষাতত্ত্ববিদ্, যেমন Sylvain Levi, Jean Przy Luski এবং Jule Bloch প্রভৃতির কোল ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর বিচিত্র শব্দের 'সংস্কৃত' (বা 'Indo-Aryan') বলয়ে অনুপ্রবেশ বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচি এ জাতীয় প্রবন্ধসমূহ ফরাসি থেকে ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশ করলেন। আচার্য সুনীতিকুমারও ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীতে সাঁওতাল প্রভৃতি বা আদিম যুগে Austric শব্দের অবস্থান সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। এ জাতীয় একটি পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India নামে। ভূমিকায় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচি লেখেন— ''A number of similarities between Indo-Aryan and Austric words have been suggested by my friend and colleague Dr. S.K. Chatterji and suggestions have also occured to me.'' এই রচনাগুলিতে ঘুরে-ফিরে একটি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে— আর্যরা এ দেশে এসেছে অথচ তাদের ভাষায় এত অনার্য শব্দ ঢুকল কী করে। আসলে আর্য নামক জাতিগোষ্ঠী ও তাদের এ দেশে আগমন বিষয়ক কল্পিত বুর্জোয়া ধারণাকে যদি আমরা অস্বীকার করি, তা হলে অতি নিম্নস্তরের আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে বিচিত্র সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির নৈকট্য-সূত্রটি বিধৃত হবে।

৩

এখন আমরা বাঙালি জাতি ও ভাষার উৎস সন্ধানে অগ্রসর হব। বাঙালি জাতির উৎস বিষয়ে সমস্ত ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানী একমত যে— বাঙালি শুধু সংকর জাতি নয়, বাঙালির চোদ্দ আনাই আদিবাসী রক্ত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ''মস্তিস্কের গঠনপ্রণালী হইতে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমনকি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের সহিত অপর কোনো প্রদেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।''

ঐতিহাসিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের বিচার-বিশ্লেষণের পর। নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক স্তরে Physical Anthropology বা শারীরিক নৃবিজ্ঞান মূল্য পেয়েছিল বেশি। এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি প্রথমত নিউ ইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পাঠ গ্রহণ করেন, পরে ব্রাউন ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তারপর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন। বার্লিন বৈপ্লবিক পার্টির তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বলতে গেলে, তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। মস্কোয় গিয়ে তিনি লেনিনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। পৃথিবীর বহু ভাষায় পণ্ডিত ভূপেন্দ্রনাথ আর্য জাতির আগমন প্রভৃতিকে অলীক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি শারীরিক নৃবিজ্ঞানের মাধ্যমেই প্রমাণ করেছেন এ দেশের ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে আদিবাসী সাঁওতাল পর্যন্ত সকলেরই শরীরগঠনে সাদৃশ্যের কারণ।

এর সামান্য পরেই নৃবিজ্ঞান চর্চা নতুন মোড় নেয় সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর বিচার-বিশ্লেষণে। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, অসাধারণ পণ্ডিত এবং

সবচেয়ে জটিল সময়ে তাঁকে হতে হয়েছিল মহাত্মা গান্ধির ব্যক্তিগত সচিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক বাস্তব তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে ক্ষেত্র-গবেষণা করে দেখেছেন, আদিবাসী গোষ্ঠীর এক-একটি দল এক-একটি caste বা জাত হিসাবে ঢুকে গিয়ে একটি জীবিকা গ্রহণ করেছে ও হিন্দু সমাজবিধি অনুসরণ করতে শুরু করেছে। তাঁর *হিন্দু সমাজের গড়ন* পুস্তকটি (বিশ্বভারতী) এই আলোকে লেখা অনবদ্য পুস্তক। তুলনামূলক সংস্কৃতির বিচার অর্থাৎ আদিবাসী সংস্কৃতি ও তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতির সম্পর্ক সন্ধানে তিনি পথ দেখালেন তাঁর Cultural Anthropology পুস্তকের মাধ্যমে। এই বইটির জন্য তিনি মাত্র ৩০-৩৫ বছর বয়সে পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই পুস্তকের প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রবন্ধ The Hindu Method of Tribal Absorption প্রবন্ধটিতে ভারতের সনাতন সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা কী ভাবে এক-একটি উপজাতি গোষ্ঠীতে এক-একটি জীবিকার (occupation) ভার দিয়ে এক-একটি caste বা জাতে স্থানিত করেছে, তিনি তা দেখিয়েছেন, এবং এই পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয়। বর্তমান লেখক ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছেন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া এখনও বিদ্যমান। গত দশ বছর (২০০০ সালের পর) Tibeto Burman-দের মধ্যে কাজ করে দেখেছি উত্তরবঙ্গের বিশাল কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে বোডো জাতির বিচিত্র শাখা-প্রশাখার সমবায়ে। বিশেষ করে মেচ ও ধীমালরা এখনও রাজবংশীতে পরিণত হচ্ছে। বর্তমান লেখকের মেচ বন্ধু বলেছেন, তাঁর ঠাকুরদার সময়ই বহু মেচ পরিবার রাজবংশী হয়ে যায়। মেচি নদীর তীর ধরে ধীমাল পল্লি থেকে জানতে পারা যায় যে ধীমাল উপজাতির লোকজন এখনও ধীরে-ধীরে রাজবংশী হচ্ছে। ধীমাল ও রাজবংশীদের মধ্যে এখনও বৈবাহিক যোগাযোগ বিদ্যমান। বোডো ভাষাগোষ্ঠীর ধীমাল বা মেচরা বাংলাভাষী রাজবংশী হলেও তাদের সংস্কৃতিতে বোডো উপাদান কিছু-না-কিছু থাকবেই। অনেক পূর্বে ড. শহীদুল্লাহর লেখায় পড়েছিলাম আসাম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের ভাষায় বোডোদের প্রভাব বিষয়ে বিচার আবশ্যক।

এই অবসরে আমরা Hindu Method of Tribal Absorption সূত্রটির সামান্য ব্যাখ্যা করে নিচ্ছি। বিচিত্র উপজাতি গোষ্ঠীর নানা শাখা একত্রিত হয়ে সমবায় পদ্ধতিতে যে হিন্দু বলয় বা ভারতীয় সমাজ গড়ে এসেছে, এই ঐতিহাসিক ঘটনা নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছিলেন। রিসলি-র সময় থেকে Hindu Method of Tribal Absorption উল্লিখিত দেখি। ভারতীয় সমাজ নানা জীবিকামূলক জাতে গঠিত এবং এই বর্ণাশ্রম প্রথাকে বলা হয় Socio-economic Pattern. কিন্তু অধ্যাপক নির্মলকুমারের কৃতিত্ব হল জুয়াং বা পাতুয়া শবর, চাপুয়া কামার বা অসুর এবং